

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

খুলাফায়ে রাশেদার জীবন ও কর্ম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদমান সামি সাদ

রোলঃ ২৩১০০১১০৪৩৬

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

খুলাফায়ে রাশেদার জীবন ও কর্ম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদমান সামি সাদ

রোলঃ ২৩১০০১১০৪৩৬

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ খুলাফায়ে রাশেদার জীবন ও কর্ম ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদমান সামি সাদ, আইডিঃ ২৩১০০১১০৪৩৬ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ খুলাফায়ে রাশেদার জীবন ও কর্ম ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

সাদমান সামি সাদ

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আইডিঃ ২৩১০০১১০৪৩৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১: ভূমিকা.....	5
অধ্যায় - ২ আবু বকরের [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] জীবন ও কর্ম.....	10
অধ্যায় ৩ উমর ফারুক [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] প্রশাসন ও শাসন ব্যবস্থা.....	16
অধ্যায়-৪ উসমান [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] কুরআন সংরক্ষণ ও চ্যালেঞ্জ.....	20
অধ্যায় -৫ আলী হায়দার [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] সংকট ও নেতৃত্ব.....	27

অধ্যায়-১: ভূমিকা

খিলাফাহ কী?

‘খিলাফাহ’ শব্দের অর্থ শাব্দিক অর্থ - প্রতিনিধিত্ব। পারিভাষিক অর্থে- মুসলিমদের দ্বীনি ও দুনিয়াবি বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করা, শরীয়াহ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা।

আব্দুল হাই কান্ডানী খিলাফাহ সংস্থা এভাবে করেছেন - খিলাফাহ হচ্ছে সর্বোচ্চ ব্যাপ্ত ক্ষমতা। অর্থাৎ শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ টাই হচ্ছে খিলাফাহ। দুনিয়ায় পূর্ব থেকে পশ্চিম কিবা উত্তর থেকে দক্ষিণ কত হাজারই না শাসন ব্যবস্থ্য বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু খিলাফাহই হচ্ছে এমন এর মধ্যে সর্বোচ্চ শাসনব্যবস্থা। কেননা এর মাধ্যমে তো খোদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়লাই কর্তৃত্ব করছে কেবল এক নগণ্য মানুষের দ্বারা।

শাইখ রশিদ রিদার মতে - খিলাফাত, ইমামাতে উযমা, ইমারাতুল মুমিনিন তিনটি শব্দ দ্বারাই উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখর; যার উদ্দেশ্য দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যান সাধন।

এ খিলাফাহই একমাত্র শাসন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অন্য কোন শাসন ব্যবস্থায় হয়নি এমনকি হবেও না।

সহজ ভাষায় আমরা খিলাফাহ কে এভাবে সঙ্গায়িত করতে পারি যে- আল্লাহর যমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা। সে অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা।¹

খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব -

আহলে সুন্নাহর আলিমদের ইজমা অনুসারে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব। এ

¹ [খিলাফাহ পৃ. ২২-২৩ ইমরান রায়হান]

বিষয়ে সাহাবী ও তাবিয়ীদের ইজারা রয়েছে। ইবনু হাযম আন্দালুসী রাইমাছল্লহ লিখেছেন, “আহলুস সুন্নাহ, শিয়া; খাওয়ারিজ সকলের মতে খিলাফাহ বা খলিফা নির্ধারণ করা ওয়াজিব।”

এই দুনিয়ার আকাশ যমিন, সবই তো আল্লাহর সৃষ্টি তাঁর ইশারা ছাড়া তো চোখ মেলে তাকানোই কভু সম্ভব নয়। দিন শেষে রাত, রাত পোহালেই দিনের দিনের সূচনা হয় সোনালী রঙের আভা সূর্যের আলো দিয়ে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, এভাবেই এক পর্যায়ে এসে হাজির হয় শীতের সেই অমূল্য ক্ষণ। যা শেষ না হতেই আসে বসন্তকাল যা এই কোমল হৃদয়ে দিয়ে যায় বসন্তের দোলা।

এই আকাশ যমিনের প্রতিটি স্থানে চিন্তা গবেষণা ও বিশ্লেষণের দৃষ্টি বুলালে দেখতে পাব আল্লাহর কি অপরূপ কুদরত। যা প্রতিটি জয়েগা কে বেষ্টন করে আছে। তবুও আমরা কেন যেন সেই স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'য়লাকে ভুলে মুখিয়ে আছি তারই সৃষ্ট মানুষের দিকে। যাদের নেই ঈশ্বং ক্ষমতা, তারাই ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার শাসন ব্যবস্থার বিপরীতে হাজারো তত্ত্ব মন্ত, মতবাদ দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে। আর আমরা তাদের ফাঁদে পা দিয়ে বেমালাম যেন ভুলে গেছি পরম করুণাময় আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'য়লাকে।

আল্লাহ তায়লা যেহেতু পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর, প্রতিটি বস্তু তারই কুদরতি হাতে সৃষ্টি; সেহেতু বিশ্ব তো চলা উচিত ছিল তারই শাসনব্যবস্থা খিলাফার মাধ্যমে। তা না হলে কেমন যেন মনে হয়, সাময়িক সময়ের জন্য সৃষ্ট হয়েও স্রষ্টার উপর হাত ঘোরানোর এক অব্যর্থ চেষ্টা। সামনে কিছু আয়াতের দিকে আলোকপাত করা যাক -

أَلَا لَهُ الْخُكْمُ. ১

অর্থ - জেনে রেখো, বিধান বা নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা তারই।^২

^২ [সূরা আনআম - ৬২]

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ۨ

অর্থ - আর আসমান ও জমিনের বাদশাহী তো আল্লাহর জন্যই। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী।³

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. ۓ
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ - বলুন হে আল্লাহ আপনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করেন। আপনারই হাতে রয়েছে যাবতীয় করলাম। নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।⁴

এসকল আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শাসন ব্যবস্থা থাকবে একমাত্র আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালায় অধীনে অর্থাৎ তারই আইনানুযায়ী তারই জমিনে শাসন ব্যবস্থা চলবে। এই একটি আর দেওয়া হয়নি অন্য কাউকে।

খেলাফার কিছু বৈশিষ্ট্য -

এই তামাম দুনিয়ার প্রত্যেকটা বস্তু বা জিনিসের রয়েছে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোন জিনিস কেই কল্পনা করা যায় না। গোটা বিশ্বে চলমান আছে বিভিন্ন ধরনের বাদ মতবাদ যা অগণিত। তবে এরই বাহিরে একটি হচ্ছে খিলাফাহ যা একটি স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা। যার সাথে অন্য কোন বাদ মতবাদের সামান্যতম মিল নেই। কেননা এর ধারণা খোদ আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা'য়ালাতার কিতাব কুরয়ানুল হাকিমে নাযিল করেছেন। এবং এই খিলাফাহ আর যমিনে কায়েম করার জন্য তিনি নবী রাসুলদের আগমন ঘটিয়েছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে। শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়ার পাশাপাশি জিহাদের মাধ্যমে মদিনা শহরে খেলাফত কায়েম করেছেন। যা তার ওফাতের পর হাজার বছরের বেশি ধরে এই বিশ্ব চলমান ছিল। পরিশেষে আমরা নিম্নে খিলাফাহর কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছি।

১. খলিফার অধীনে যেসব রাষ্ট্র থাকবে সেসব অঞ্চল চলবে খোদ আল্লাহ

³ [আল ইমরান - ১৮৯]

⁴ [সূরা আল ইমরান - ২৬]

সুবহানাহু ওয়া তা'আলার গ্রন্থ তথা আল কুরআন এবং তারই প্রেরিত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী।

২. আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ তথা মজলিসে শুরার কর্তৃক একজন খলিফা নির্বাচন করা হবে।

৩. খলিফা কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, এর বিপরীত করলে জনগণ খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারবে।

নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নেতৃত্ব -

নবীজি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন তখন ক্রমাগত প্রয়োজনানুসারে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযিল হতে থাকে। এভাবে প্রায় তেরোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়।

ইসলামের ভেতর যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা রয়েছে সেহেতু ইসলাম সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজ হাতে নিতে হবে এছাড়া দ্বীনকে কখনোই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে মক্কা থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে হিজরত করেন এবং মদিনা-কে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলেন। এরপর তিনি রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে চলতে থাকে আরো দশটি বছর প্রায় তেরো হিজরীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহকাল ত্যাগ করে চলে যান না ফেরার দেশে। [ইম্মালিল্লাহি ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজিউন]

যেহেতু তিনি ছিলেন এই জগতে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আল কিছু কিছু বিষয় তাকে আগাম অভিহিত করতেন। তেমনি একটা বিষয় ছিল যে তার মৃত্যুর পর সমাজ একটাই বিরূপ প্রভাব পড়বে তাই তিনি ইশারাইঙ্গিতে মৃত্যুর পূর্বেই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে পরবর্তীতে তার খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ওফাতের পর খলিফাদের নেতৃত্বে বেশ কিছু কারণ আছে তার মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে -

১. নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মৃত্যুর পর নেতা কাকে মানা হবে সেটা নিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় জানি নিয়ন্ত্রণ করতে নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল।
২. অনেকে ইসলাম ত্যাগ করে পূর্বের ধর্মে প্রবেশ করতে শুরু করে। তাদের বোঝানোর জন্য প্রয়োজন ছিল একজন নেতার।
৩. অনেক সাহাবীদের মধ্যেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা যায় যে নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মৃত্যু হয়ে গেল তাহলে কি ইসলামেরও বিলুপ্তি ঘটবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এদের সবাইকে একটি ছায়াতলে আনতেও প্রয়োজন ছিল একজন নেতৃত্বের।

এছাড়া আরো অনেক বিষয়েই রয়েছে যা সীরাত ও ইসলামের ইতিহাসের বই পত্র পড়লে বোঝা যায় যে নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] পর নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা।

অধ্যায় - ২ আবু বকরের [রাদিয়াল্লাহু আনহু] জীবন ও কর্ম

আমরা আবু বকরের [রাদিয়াল্লাহু আনহু] জীবন ও কর্ম আলোচনার আগে খুলাফায়ে রাশেদা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে আসি।

খুলাফায়ে রাশেদা বলতে কী বোঝায়?

খুলাফা শব্দটি এসেছে মূলত খলিফা থেকে। খলিফা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধি।

খুলাফা হচ্ছে খলিফা শব্দের বহুবচন। অতএব বোঝা যায় খুলাফা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধিবৃন্দ। রাশেদা শব্দটি এসেছে মূলত রুশদুন শব্দ হতে যার অর্থ সঠিক পথ।

তাহলে রাশেদা শব্দের অর্থ দাঁড়ায় সঠিক পথ প্রাপ্ত।

পরিশেষে আমরা পুরো খোলাফায়ে রাশেদা শব্দের অর্থ দাঁড় করাতে পারি সঠিক পথ প্রাপ্ত খলিফা বৃন্দ।

পরিভাষায় আমরা বলতে পারি, যে সমস্ত খলিফা পরিপূর্ণভাবে সঠিক পথে খিলাফাহ ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন তাদের কি বলা হয় খুলাফায়ে রাশেদা।

ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন যারা নবীজির ওফাতের পর তাই রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাল্হু ওয়া তায়ালা ইসলামকে নিভে যাওয়া তো দূরের কথা বরং তারা ইসলামকে সারা বিশ্বের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে দিয়েছেন হাজারো বিশৃঙ্খলার বিষদাঁত। কাবু করেছেন শত শত ইসলামের শত্রুদের হাজারও ফিতনা মাথা উচু করে ওঠার আগেই সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছেন তারা। ইসলামের জন্য এমন দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন যা পরবর্তী যুগে শত খলিফার দ্বারা সম্ভবপর হয়নি বরং তাই মুসলিমদের একমাত্র আদর্শ। কেনই বা হবেন না তারা যে স্বয়ং নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] হাতে গড়া প্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ কতিপয় সাহাবী। তাদের মাঝে রয়েছে মুসলিমদের শিক্ষা গ্রহণের হাজারো দিক। নিম্নে ক্রমে ক্রমে তাদের জীবন ও কর্মের সামান্য দিক ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হবে ইন-শা-আল্লাহ।
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু -

নাম ও বংশ - আব্দুল্লাহ নাম তার, সিদ্দিক ও আতিক উপাধি। কুনিয়াত তথা ডাক নাম আবু বকর এ নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। পিতা ওসমান কুনিয়াত আবু কুহাফা মাতা সালমা কুনিয়াত উম্মুল খায়র। কুরাইশ বংশের উপর দিয়ে ষষ্ঠ পুরুষ মোড়রাতে গিয়ে নবীজির [সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সাথে মিলিত হয়েছে।

জন্ম ও মৃত্যু - আবু বকর [রাদিয়াল্লাহু আনহু] জন্মগ্রহণ করেন নবীজির [সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] জন্মের দুই বছরের বেশি কিছু সময় পর। তার মৃত্যুও তাই হয় অর্থাৎ নবীজির [সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] মৃত্যুর দুই বছরের কিছু সময় পর।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য - আবু বকর [রাদিয়াল্লাহু আনহু] ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, পাতলা, ছিপ ছিপে, ও প্রশস্ত বিশিষ্ট। শেষ বয়সে চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। মেহেদির হিজাব লাগাতেন। ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য - আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার গোত্রের অত্যন্ত জনপ্রিয়, বন্ধু বৎসাল ও অমায়িক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী দানশীল ও চরিত্রবান। জাহেলী যুগেও কখনো শরাব পান করেননি। তার অমায়িক মেলামেশা পাণ্ডিত্য ও ব্যবসায়িক দক্ষতার কারণে অনেকেই তার সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা স্থাপন করতেন।⁵

ছোট থেকেই আবু বকরের [রাদিয়াল্লাহু আনহু] সাথে নবীজির [সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। উত্তম ব্যক্তির সাথে উত্তম ব্যক্তির বন্ধুত্ব হবে এটাই তো স্বাভাবিক। এমনকি তিনি নবীজির [সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বাণিজ্যিক সফরের সঙ্গী ছিলেন। তার কথাবার্তা আচার-আচরণ ছিল এতটাই নম্র যা কল্পনাভীত। প্রতিটি বিষয়ে তিনি ধীরে সুস্থে বিবেচনা করতেন। রাগ যেন ছিল তার অভিধানের বাইরে। তবে প্রয়োজন বোধে ইসলামের ক্ষেত্রে ক্ষিপ্তও হতেন বটে।

খিলাফাত গ্রহণের প্রেক্ষাপট -

নবীজির [সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ওফাতের পর কে পরবর্তী খলিফা হবেন তা নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে আলোচনা পর্যালোচনা শুরু হলো। সাহাবীদের একটি দল

⁵ [আসহাবে রাসুলের জীবন কথা খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫]

মসজিদে নববীতে একত্রিত হলো। এই দলে মুজাহিদদের সংখ্যা ছিলো বেশি এবং আনসাররা ছিলো কম। মসজিদে নববীতে আবু বকর [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] তার বক্তৃতা শেষ করে নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] কাফন-দাফনের উপকরণ প্রস্তুত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অপরদিকে সাকিফা ও বনু সাইদায় পরবর্তী খলিফার ব্যাপারে আলোচনা করছেন। যেহেতু আনসারদের আধিক্য ছিল তাই নিজেদের মধ্যে একজনকে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করতে চাইলেন। অন্যদিকে খাজরাজ গোত্রের সাহাবীরাও চিন্তা ভাবনা করল তাদের মধ্যে থেকে একজনকে খলিফা বানাতে হবে।

বিষয়টি তর্ক বিতর্কতেই থাকলো না বরং যুদ্ধ ও সংঘাতের আশঙ্কা দেখা দিল। এদিকে ওমর ফারুক [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] তরবারি হাতে চক্রর দিচ্ছিলেন আর বললেন, “যে বলবেন মৃত হয়েছে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।” তাই আবু বকর [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] আশংকা করলেন যে এখানেও চরম উত্তেজনা ও গভীর শোকে করে না ফেলেন। তাই তিনি নিজেই সমাবেশকে সম্বোধন করে বক্তৃতা শুরু করলেন এবং বললেন, “প্রথমে মুহাজিরগণ আমার হবেন এবং আনসারগণ হবেন ওয়াজির”

এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে হযরত বশির ইবনু নোমান ইবন কাব ইবন আনসারী উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, “নবীজি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নিঃসন্দেহে কুরাইশ বংশের ছিলেন তার কওম অর্থাৎ কুরাইশের লোকেরাই খিলাফতের বেশি হকদার। আমরা নিঃসন্দেহে দ্বীন ইসলামের সাহায্য করেছি এবং আমরা অগ্রবর্তী মুসলমান। কিন্তু আমাদের ইসলাম গ্রহণ এবং নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] জন্য প্রস্তুত হওয়া নিছক আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই ছিল তার প্রতিদান আমরা দুনিয়ায় চাই না।”

হযরত বশিরের [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] থেকে অন্য কয়েকজন আনসার ও সমর্থন করলেন ইবনুল মুনযিরও কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন। তার চুপ করার সাথে সাথে পুরো সমাবেশের উপর নীরবতা নেমে এলো। এমনকি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যের বিবাদ বিসংবাদও গেল কেটে।

আবু বকর [রদিয়াল্লাহু আনহু] বললেন আবু ওবায়দা উপস্থিত আছেন তাদের যে কোন একজনকে বেছে নাও। উভয়ই বললেন, “না হযরত আবু বকর সিদ্দিক মুহাজিরদের মধ্যে সর্বপৃষ্ঠ সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির তিনি সাওর গুহায় নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সঙ্গী ছিলেন সালাতের ইমামতি করানোর ক্ষেত্রে নবীজি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাকে প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন। অথচ সালাত হচ্ছে দিনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আমল। আবু বকরের [রদিয়াল্লাহু আনহু] বর্তমানে কোন ব্যক্তি খলিফা ও আমির হওয়ার যোগ্য হতে পারে না।”

তৎক্ষণাৎ হযরত ওমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] আবু বকরের [রদিয়াল্লাহু আনহু] হাতে বায়াত করলেন এমনকি সকল মাহাজির ও আনসারগণ তার হাতে বিনা মতানৈক্যে সর্বসম্মতভাবে বায়াত গ্রহণ করলেন।

খিলাফাত গ্রহণের পর ভাষণ -

বায়তে সাকিফা থেকে ফিরে এসে নবীজ দাফন কাফন শেষ করে মসজিদে নববীতে আবু বকর সিদ্দিক মেস্বারের ওপর উপনিবেশ করে সাধারণ লোকদের বায়াত গ্রহণ করলেন। তারপর দন্ডায়মান হয়ে ভাষণ দেন এবং হামদ ও না'ত এরপর উদ্দেশ্য করে বললেন ;

“আমি তোমাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছি অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। সুতরাং আমি যদি সৎ কাজ করি তবে তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমাকে সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত করা। সত্যবাদিতা ও সত্য কথা বলা একটি আমানত মিথ্যা কথা হচ্ছে একটি খেয়ানত। তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল সে আমার নিকট শক্তিশালী যে পর্যন্ত আমি তার প্রাপ্য বুঝিয়ে না দেই। আর তোমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী সে আমার নিকট দুর্বল পর্যন্ত আমি তার নিকট থেকে প্রাপ্য অধিকার না নেই। তোমরা জিহাদ করবে না। যে জাতীয় জিহাদ পরিত্যাগ করে সে জাতী অপমানিত হয়। আমি যতদিন আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করব ততদিন তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করি, তবে তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করবে। কেননা আমার আনুগত্য করা ফরজ নয়। ”

রিদ্দার যুদ্ধ -

আবু বকরের [রদিয়াল্লাহু আনহু] খিলাফাত কালে একদল ধর্মত্যাগী এবং বিদ্রোহী ইসলামের ফরজ বিধান যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং যাকাতের বিরোধিতা করে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন আবু বকর [রদিয়াল্লাহু আনহু]। কয়েকজন সাহাবীর নেতৃত্বে আরবের ইয়ামামা, বাহরাইন ও ইয়েমেন ইত্যাদি এলাকায় সৈন্যবাহিনী পাঠান।

ধর্মত্যাগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইয়ামামার অধিবাসী মিথ্যাবাদী মুসাইলামা। সেই নিজেকে নবী দাবি করত। মুসাইলামা যখন বনি তামিমের সাজাহ নামক জনৈক মহিলাকে বিয়ে করে তখন তার ফিতনা ভয়াবহ রূপ নেয়। কেননা তার স্ত্রী সাজাহ নিজ স্বামীর মত নবী দাবি করেছিল।

রিকদার যুদ্ধে সাহাবীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সাহসিকতার পরিচয় দেন তারা হলেন - খালিদ বিন ওয়ালিদ, ইকরিমা বিন আবু জাহ্ল, আমর ইবনুল আস [রদিয়াল্লাহু আনহুম] প্রমুখ। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী চারজন সাহাবী আমার বিন ইয়াসির, সালেম বিন সালেম, আবু হুজাইফা বিন উতবা, আব্দুল্লাহ বিন সাহল এই যুদ্ধে শহীদ হন।

এই রিকদার যুদ্ধের মাধ্যমে আরব উপদ্বীপ ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহী মুক্ত হয় এবং ইসলামের ঝাণ্ডাতলে স্বাধীনভাবে এক আল্লাহর একত্ববাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।^৬

^৬ [ইসলামের ইতিহাস, ডক্টর ইব্রাহিম আশ-শারিকি পৃষ্ঠা ১০২]

কুরআন একত্রীকরণ -

বিভিন্ন যুদ্ধে হাফেজদের একটি বড় অংশ শহীদ হয়ে যাওয়ার দরুন আবু বকর [রাদিয়াল্লাহু আনহু] সম্পূর্ণ কোরআন একত্রিত করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া দেন জাহিদ বিন হারেসাকে [রাদিয়াল্লাহু আনহু]।

খেজুর পাতা পাথরের টুকরা এবং মানুষের স্মৃতি থেকে কোরআনের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো একত্রিত করা হয়। আবু বকরের [রাদিয়াল্লাহু আনহু] যুগে সমাপ্ত হযকুরআন একত্রিকরণের কাজ। কোরআনের কোন বিকৃতি সাধন যেন না হয়, সেজন্য ওফাতের পূর্বেই আল্লাহর পবিত্র এই কোরআন একত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

শেষ কথা -

আবু বকর [রাদিয়াল্লাহু আনহু] ছিলেন মুত্তাকী পরহেজগার এবং আল্লাহর শরীয়তের নির্দেশ বাস্তবায়নকারী এক ব্যক্তিত্ব। ১৩ হিজরী মোতাবেক ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ওফাত লাভ করেন। তার শাসনকাল ছিল দুই বছর তিন মাস। আল্লাহর রাসুলের আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কক্ষ তাকে দাফন করা হয়।⁷

⁷ [ইসলামের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১০৪ থেকে ১০৪]

অধ্যায় ৩ উমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু] প্রশাসন ও শাসন ব্যবস্থা

নাম ও বংশ - নাম উমর, ফারুক তার উপাধি। তার কুনিয়াত আবু হাফস। পিতা খাত্তাব, হানতামা তার মাতা। তার গোত্র ছিল কুরাইশের আদি। উমারের অষ্টম পুরুষ তথা কাব নামক ব্যক্তির সাথে নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বংশের সাথে মিলিত হয়।

জন্ম - নবীজির জন্মের ১৩ বছর পর উমারের [রদিয়াল্লাহু আনহু] জন্ম হয় তবে তার জন্ম ও ইসলাম গ্রহণের সন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে রয়েছে মতানৈক্য।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য - উমারের [রদিয়াল্লাহু আনহু] গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, টাক মাথা, ঘন দাড়ি, মোচের দু'পাশ লম্বা ও পুরু এবং শরীর দীর্ঘা আকৃতির হাজার মানুষের মধ্যেও তাকেই সবার চেয়ে লম্বা দেখা যেত।

কতিপয় বৈশিষ্ট্য - উমর ফারুকের [রদিয়াল্লাহু আনহু] পরিচয়, গুণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলতে গেলে পুরোটাই বীরত্ব ও সাহসিকতার গল্প। তিনি যুদ্ধবিদ্যা, বক্তৃতা ও শিক্ষা প্রভৃতি আয়ত্ত করেন। ছিলেন জাহিলি যুগের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগির এমনকি ঘোর সবারও বটে।

আল্লামা জাহিদ বলেছেন, “উমর [রদিয়াল্লাহু আনহু] ঘোড়ায় চড়লে মনে হত যেন ঘোরার চামড়ার সাথে তার শরীর মিশে গেছে। ” তার কাব্য প্রতিভা ছিল অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল তার সহ জাতগুণ।

“নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নবুয়াত প্রাপ্তির সময় গোটা কুরাইশ বংশের মাত্র ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন তার মধ্যে একজন উমর ” - বলেছেন বালাজুরী।

প্রশাসনিক সংস্কার - ওমর ফারুক [রদিয়াল্লাহু আনহু] প্রশাসনিক সংস্কার সুবিধার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে মোট ১৪ টি প্রদেশে বিন্যস্ত করে প্রদেশগুলোকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কর্তৃত্ব করেন। প্রত্যেক প্রদেশকে আবার কতগুলো জেলায় ভাগ করেন।

প্রাদেশিক শাসনকর্তা বলা হত ওয়ালী এবং জেলা শাসনকর্তাকে বলা হত আমিন।
প্রদেশের বিচারের জন্য কাজী এবং কোষাগারের জন্য কোষাধ্যক্ষ থাকতেন।^৪

বাইতুল মাল - ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুচারু রূপে পরিচালিত হওয়ার জন্য চাই
মজবুত অর্থ ব্যবস্থা। ইসলামের রয়েছে অর্থ ব্যবস্থা সুনির্দিষ্টে রূপরেখা। ইসলামী অর্থ
ব্যবস্থার বড় অংশই দারুল ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ দারুল ইসলাম নাহলে
ইসলামী অর্থনীতির শতভাগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

যেমন যাকাতের কথাই ধরা যাক। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যাকাতের কোন অবস্থান
নেই। সামগ্রিকভাবে যাকাত আদায় হচ্ছে না। মাত্র গুটি কয়েক ব্যক্তিগত প্রকল্পই
দেখা যায়। যার দরুন সামগ্রিক কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। যদি শতকরা
যাকাত আদায় এবং এর প্রকৃত হকদারকে দেওয়া যেত তবে সমাজ থেকে ধীরে
ধীরে দারিদ্রতা কমে যেত। গরিবরা আর গরিব থাকতো না।

বর্তমান আধুনিক সমাজে ইসলামী ব্যাংক বা অর্থনীতির নামে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা
করেই লিয়াজো গোড়াই আমরা ইসলামী অর্থনীতির ফাঁকা বুলি দিচ্ছি। সমাজে
ইসলামী অর্থনীতির অর্ধেকটাও বাস্তবায়ন হচ্ছে না, হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। কেননা
তার জন্য প্রয়োজন দারুল ইসলাম দারুল। দারুল ইসলাম পেলে শুধু ইসলামী
অর্থনীতিই নয় বরং ইসলামের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে, আমলের
স্বাদ মিলবে।

নবীজি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] প্রথম মদিনা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
করেন তখন থেকেই বায়তুল মালের কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু তখন কোন সুনির্দিষ্ট
কাঠামো ছিল না। এর কারণও স্পষ্ট, তখন ইসলামের রাষ্ট্র ছিল ছোট। ফলে যে অর্থ
মদিনায় আসত তারা তৎক্ষণাত বন্টন হয়ে যেত। পরবর্তীতে ওমর খেলাফতকালে
ইসলামী রাষ্ট্রের আয়তন ক্রমেই বাঁড়তে থাকে তখন এদিকে যেমন প্রচুর গনিমতের
মাল ও পশুর মদিনায় ঢুকছিল তেমনি ব্যয়েরও অনেক খাত দেখা দেয় যা পূর্বে ছিল
না। ফলে এ সময় এমন একটি মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন দেখা যায় যেখানে এই অর্থ
সুখম বন্টন ব্যবস্থা থাকবে। এ চিন্তা থেকেই ফারুক ভাবে প্রথম বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা

^৪ [ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি পৃ.১৫৪]

করেন।

বাইতুল মালের আয়ের উৎস -

সাধারণত বাইতুল মাল ৭ টি উৎস হতে আয় করে থাকে।

১. যাকাত ২. জিযিয়া ৩. খারাজ ৪. উশর ৫. গনিমাত ৬. ফাই ৭. অন্যান্য খাত।^৯

বিচার ব্যবস্থা -

নিরপেক্ষভাবে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য নবীজির বিচার বিভাগের যাত্রা শুরু করেছিলেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রতিটি প্রদেশে একজন করে কাজী নিযুক্ত করতেন। হযরত ওমরের [রদিয়াল্লাহু আনহু] সময় বিচার বিভাগ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা, বিচারক নিয়োগ ও রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন করা হয়। বিচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কাজী বলা হত। কেন্দ্রে খলিফা নিজেই প্রধান কাজীর দায়িত্ব পালন করতেন। কাজী নিয়োগ দেওয়া হতো মূলত যোগ্যতার বিচারে। কাজীরা তাদের কাজের উপযুক্ত বেতন পেতেন। তাদের দায়িত্ব ছিল বিবাদ নিষ্পত্তি করা, অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, ওয়াকফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়ন করা, ওসিয়ত কার্যকর করা, নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করা, বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা, জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ সাধন, অধীনস্থদের ওপর কর্তৃত্ব রাখা এবং তাদের আচরণের উপর লক্ষ্য রাখা।

বিচারের ক্ষেত্রে উমারের [রদিয়াল্লাহু আনহু] নির্দেশ ছিল যেসব মুসলমানকে দিন শাস্তি দেওয়া হয়নি এবং যার সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি, কেবল তাদের সাক্ষ্যই গৃহীত হবে।^{১০}

জেরুজালেম বিজয় -

সে সময় আবু ওবায়দা ইবনুল জাররার [রদিয়াল্লাহু আনহু] নেতৃত্বে মুসলিম সেনারা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করছিল। একটা সময় আমর ইবনুল আস [রদিয়াল্লাহু আনহু] আজনাদাইন নামক স্থানে রোমানদের কে পরাজিত করে বাইতুল মাকদিস অভিমুখে

^৯ [খিলাফাহ- ইমরান রায়হান পৃষ্ঠা ১০৩-১০৫]

^{১০} [ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি পৃষ্ঠা ১৫৫]

অগ্রসর হন। তিনি সেখানে পৌঁছে দীর্ঘ সময় জেরুজালেম অবরোধ করে রাখেন। পেট্রিয়ার্ক সফ্রোনিয়াস খলিফা উমারের [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] ব্যক্তিগত উপস্থিতির শর্তে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হন।

এরপর উমার ইবনুল খাতাব [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু]

মদিনা থেকে জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। পথিমধ্যে সিরিয়ার অবস্থা পরিদর্শন করতে যান। এরপর তিনি ১৬ হিজরী মোতাবেক ৬৩৭ সালে জেরুজালেম পৌঁছান। পেট্রিয়ার্ক সফ্রোনিয়াস খলিফা উমারকে [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] স্বাগত জানিয়ে তার কাছে জেরুজালেম শহর অর্পণ করেন। উমার ইবনুল খাতাব [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] খ্রিস্টানদের তাদের জীবন ও ধন সম্পদ হেফাজতের নিরাপত্তা দেন। তাদেরকে ধর্মীয় উপাসনার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেন।

পেট্রিয়ার্ক সফ্রোনিয়াস উমারের [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] কাজে আকৃষ্ট হয়ে বলে ওঠে, যে আমিরুল মুমিনিন সত্যিই আপনাদের রিসালাত ন্যায় পরায়নতা, স্বাধীনতা এবং উদারতার সর্বোচ্চ মর্ম বহন করে।

এটিই ইসলামের মহান রিসালাত, যা উমার [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] মদিনা থেকে জেরুজালেম বহন করে নিয়ে যান পরদিন তিনি জেরুজালেম শহর পরিদর্শনে বের হন এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন নিদর্শন পরিদর্শন করেন। হাইকালে সুলাইমানের জায়গাতে তিনি আবর্জনা দেখতে পেয়ে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সেখানে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন।

উমারের [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] ন্যায় বিচার -

একবার ওমার [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] ও উবাই ইবনু কাবের [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] মধ্যে একটি বিষয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়। মীমাংসার জন্য তারা তৎকালীন বিচারক য়ায়েদ ইবনে সাবিতের [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] নিকটে যান। উমার [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] বিচারককে বললেন আমরা আপনার কাছে এসেছি যেন আপনি আমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেন। বিচারক য়ায়েদ [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] নিজের পাশের আসনে বসতে দিলেন আমিরুল মুমেনীন উমারকে [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু]। এতে আমিরুল মুমেনিন উমার [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। কারণ তিনি এখানে বিবাদী। আর বিচারকের নিকট শাসক-শাসিত বিবাদ-বিবাদী সবাই সমান।

মামলার রায়ের পরে উমার [রুহিয়াহ্লাহ্ আনহু] বিচারকের উদ্দেশ্যে বললেন, “আপনি বিচারকার্যের প্রকৃত স্তরে পৌঁছাতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনার কাছে আমার আর সাধারণ নাগরিকের মর্যাদা সমান হয়।”¹¹

¹¹ [আল কাউসার সংখ্যা মার্চ-২৬ আদর্শ শাসক জীবন থেকে কিছু নমুনা পৃষ্ঠা.২৬]

অধ্যায়-৪ উসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু] কুরআন সংরক্ষণ ও চ্যালেঞ্জ

নাম ও বংশ - উসমান তার নাম, কুনিয়াত হচ্ছে আবু আদিল্লাহ, আবু লায়লা।
উপাধি ছিল জুনুরাইন। ছিলেন কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান। তার বংশ
ঠিক আবদে মানাফের সাথে গিয়ে নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সাথে
মিলিত হয়। তার নানি বাইদা বিনতু আদিল মুত্তালিব নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম] ফুফু ছিলেন।

জন্ম ও মৃত্যু - উসমান বিন আফফানের [রদিয়াল্লাহু আনহু] জন্ম হয় হস্তি সনের ছয়
বছর পর তথা ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে। তবে তার জন্ম সন নিয়ে মতভেদ আছে। তিনি
শাহাদাত বরণ করেন হিজরি ১৮ জিলহজ শুক্রবার আসর নামাজের পর।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য - উসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু] ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী। মাংস
হীন গলদেশ, ঘন দাড়ি, উজ্জ্বল ফর্সা, ঘন কেশ, বুক ও কোমর চওড়া, কান পর্যন্ত
ঝুলানো জুলফি, পায়ের নলা মোটা, পশম ভরা লম্বা বাহু, মুখে বসন্তের দাগ, মেহেদী
রংয়ের দাড়ি এবং ছিল স্বর্ণখচিত দাত।

অন্যান্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য - উসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু] ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম
কুস্তিবিদ্যা বিশারদ, কুরাইশের প্রাচীন ইতিহাসেও ছিল তার গভীর জ্ঞান। তার প্রজ্ঞা,
অভিজ্ঞতা সৌজন্য ও লৌকিকতাবোধ ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য সব সময় তার পাশে
মানুষের ভিড় জমে থাকতো। জাহিলি যুগের কোন অপকর্ম তাকে স্পর্শ করতে
পারেনি। লজ্জা ও প্রখর আত্মমর্যাদা বোধ ছিল তার প্রধান বৈশিষ্ট্য।¹²

কুরআনের একক সংস্করণ সংকলন -

আনাস ইবনু মালেক [রদিয়াল্লাহু আনহু] বর্ণনা করেন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান
[রদিয়াল্লাহু আনহু] উসমানের [রদিয়াল্লাহু আনহু] কাছে গিয়ে বললেন ইহুদি ও
নাসারাদের ন্যায় আল্লাহর কিতাব নিয়ে বিপদে জড়িয়ে যাওয়ার পূর্বেই এই উম্মাহকে
রক্ষা করুন। উসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু] চিন্তা ফিকির করে হাফসার [রদিয়াল্লাহু
আনহু] পাঠালেন যে আপনার কাছে সংরক্ষিত সহিফা গুলো আমাদের কাছে পাঠিয়ে

¹² [আসহাবে রাসুলের জীবন কথা খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৪৮]

দিন; আমরা তা কয়েকটি কপি করে মূল কপি আপনার কাছে ফেরত দেব।
পরবর্তীতে হাফসা [রদ্বিয়াল্লাহু আনহা] পাঠিয়ে দেন। এরপর খলিফাতুল মুসলিমিন
উসমান [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] যায়ডবিন সাবেত, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের, সাঈদ ইবনুল
আস, আব্দুর রহমান বিন হিশান [রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম] কে নির্দেশ দিলে তারা বিভিন্ন
মাসহাফে তা কপি করলেন।

উসমান [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] সদস্যকে বললেন, “কোন বিষয়ে যদি সাথে তোমাদের
মতপার্থক্য হয় তাহলে তা কুরাইশদের ভাষায় লিখবে, কারণ কুরাইশদের ভাষায়
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।” তারা এভাবেই কুরআন সংকলন করলেন। তারা যখন
কয়েকটি কপি সংকলনের কাজ শেষ করলেন তখন মূলকপিটি হাফসার [রদ্বিয়াল্লাহু
আনহা] কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং কুরআনের লিপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ
দেন।

তার শাসনামলে বিজয়াভিযান ও প্রচুর সংখ্যক অনারবের ইসলাম গ্রহণ করার
কারণে কোরআনের পাঠ নিয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে অসংখ্য মানুষ এবং ইসলামী
সাম্রাজ্যে নতুন এক ফেতনার অভ্যুদয়ের উপক্রম হয়।

উসমান [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] চেয়েছিলেন সাত কেরাতের মধ্যে হতে নির্দিষ্ট এক
কেরাতে কোরআন লিপিবদ্ধ হোক তাই তিনি যে গোত্রের কেরাতে কুরআন অবতীর্ণ
হয়েছে অর্থাৎ কুরাইশী গোত্রের কেরাতেই তিনি কুরআন লিপিবদ্ধ করান।

নিঃসন্দেহে খলিফাতুল মুসলিমীন উসমানের [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] গৃহীত পদক্ষেপ কে
তার খিলাফত আমলের গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সকল
সাহাবায়ে কেরাম [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] এই পদক্ষেপকে সাদরে গ্রহণ করে নেন।

সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ -

পূর্ববর্তী খলিফাদের অনুরূপ উসমান বিন আফফানের [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] যুগেও
সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ অব্যাহত ছিল। খুরাসান আজারবাইজান এবং রোমান সাম্রাজ্য
শাসিত ত্রিপোলিসহ কয়েকটি শহর উসমানের [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] যুগে মুসলমানদের
দখলে আসে। এই সময় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধ হয় সেটি হল ৩৪ হিজরী তথা

৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ সনে মুসলমান শহর কর্তৃক রোমান নৌবহরকে ‘যাতুস সিওয়ারি’ নামক স্থানে পরাজিত করা।¹³
সামনে কিছু উল্লেখ করা হলো।

সাইপ্রাস বিজয় -

হযরত আনাস [রদিয়াল্লাহু আনহু] বর্ণনা করেন উম্মে হারামের [রদিয়াল্লাহু আনহা] ঘরে দুপুরে কিছুক্ষণ ঘুমান এরপর তিনি হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় জাগ্রত হন। তার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন, আমার উম্মতের একটি দলকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় দেখেছেন, বলে উত্তর দেন। বাদশা যেভাবে আপন সিংহাসনে করে সেভাবে সমুদ্রে আরোহী ছিলেন। এরপর উম্মে হারাম নবীজিকে [সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন দোয়া করুন আল্লাহ আমাকে সেই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন অতি উত্তরে নবীজি [সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বললেন তুমি দলের মধ্যেই আছো।

পরবর্তীতে ২৮ হিজরী ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ সনে উসমানের [রদিয়াল্লাহু আনহা] নেতৃত্বে সাইপ্রাস বিজয়ের অংশগ্রহণকারী নৌবাহিনী ছিল সেই প্রতিশ্রুত বাহিনী যার কথা স্বয়ং নবীজি [সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেছিলেন। যা উক্ত সনেই বিজীত হয়। এই অভিযানে উম্মে হারাম এবং তার স্বামী উবাদা বিন সামিত [রদিয়াল্লাহু আনহা] অংশগ্রহণ করেন এবং অশ্বপৃষ্ঠ হতে পড়ে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তার কবর আজও সাইপ্রাসে আছে।

কনস্টান্টিনোপল অভিযান -

নবীজির [সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] স্বপ্নে দেখা দ্বিতীয় বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া [রদিয়াল্লাহু আনহা]। তিনি কনস্টান্টিনোপলে অভিযান পরিচালনা করেন তবে উক্ত অভিযানে উম্মে হারাম শরিক হতে পারেননি।

নুবিয়া অভিযান -

৩১ হিজরি মোতাবেক ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বাহিনী আব্দুল্লাহ বিন আবুস সারহ [রদিয়াল্লাহু আনহা] বর্তমান সুদানের অন্তর্ভুক্ত নুবিয়া অঞ্চল জয় করে। এটি ছিল সে

¹³ [ইসলামের ইতিহাস পৃষ্ঠা ১১০]

যুগের অন্যতম কঠিন অভিযান। মুসলিম বাহিনী এমন এক অভিনব আক্রমণের মুখোমুখি হয় যা মোকাবেলা করে তারা অভ্যস্ত ছিল না। প্রতিপক্ষের সৈন্যরা মুসলিম সৈন্যদের চোখ লক্ষ্য করে অনবরত তীর নিক্ষেপ করতে থাকে এতে যুদ্ধের সূচনাতেই ৫০ জন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। আব্দুল্লাহ বিন আবুস সারাহ [রদিয়াল্লাহু আনহা] নুবিয়াবাসীর সঙ্গে বাকত-চুক্তি নামক একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা প্রায় ছয়শো বছর কার্যকর ছিল। চুক্তিতে ছিল নুবিয়া পরস্পর মিশরের সঙ্গে রাজস্ব বিনিময় করবে এবং উভয়ের মাঝে সব ধরনের সংজ্ঞা যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

অভ্যন্তরীণ ফিতনা -

উসমানের [রদিয়াল্লাহু আনহা] খেলাফত কালে ফিতনার আবির্ভাব শুরু করে ৩৪ হিজরি তথা ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এই ফিতনার আগুন প্রথমে প্রচলিত করে সানআ অঞ্চলের আব্দুল্লাহ বিন সাবা নামক জনৈক ইহুদি। ইতিহাসে সে ‘ইবনুস সাওদা’ নামেও প্রসিদ্ধ। উসমানের আমলে নিজেকে সে মুসলমান দাবি করে এবং জ্ঞানী আলেম হিসেবে পরিচয় দেয়।

প্রথম দিকে সে গ্রাম ও মরু অঞ্চলের অধিবাসী সহ যেসব মানুষ নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মাঝে বিদ্রোহ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হন। সে মানুষকে প্রশ্ন করত, “এটা কি প্রমাণিত নয় যে ঈসা বিন মারিয়াম এই পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবেন?” উত্তরে স্বাভাবিকভাবেই হ্যাঁ বলা হলে সে পুনরায় প্রশ্ন করত, “নবীজি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তার চেয়ে মর্যাদাশীল তাহলে তার এ পৃথিবীতে আগমনের বিষয়কে তুমি কিভাবে অস্বীকার করতে পারো?” এরপর সে বলতো “নবীজি [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আলী বিন আবু তালিবকে [রদিয়াল্লাহু আনহা] অসিয়ত করেছেন মোহাম্মদ হলেন আখেরি নবী আর আলী হলেন ওসিয়তপ্রাপ্ত। সুতরাং ওসমানের তুলনায় আলী [রদিয়াল্লাহু আনহা] খিলাফতের দায়িত্ব লাভের অধিক হকদার।”

এখন আব্দুল্লাহ বিন সাবা মিশরে চলে যায় এবং সেখানকার অধিবাসীদের অনেকেই তার আন্দোলনের প্রতি অনুরাগী করে তুলতে সক্ষম হয়। তার অনুসারীরা কুফা ও বসরার জনসাধারণের কাছে পত্র পাঠিয়ে তাদেরকেও খিলাফতের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। তারা পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে আন্দোলনে যুক্ত হয়। এসব অঞ্চলে

যেমন লোক নিজেদের বিভিন্ন স্বার্থহানির কারণে খলিফা-কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নরদের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল, তারাও ইবনে সাবার পক্ষে যোগ দেয়।

খলিফা উসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু] বিদ্রোহীদের দ্বারা ঘেরাও হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তার নির্মূল করতে পারতেন। অন্য সাহাবীরা সেজন্য প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু উসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু] নিজের জন্য অন্য কোন মুসলিমের রক্ত ঝরাতে চাননি। তিনি চাননি মুসলিমদের মধ্যে রক্তপাতের সূচনাকারী হতে। প্রকৃতপক্ষে এমন এক নাজুক মুহূর্তে উসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু] যে কর্ম পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা একজন খলিফা ও একজন বাদশার মধ্যে যে পার্থক্যটা স্পষ্ট করে তোলেন। তার স্থলে যদি কো বাদশা হতো নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে যে কোন কৌশল প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করতনা। তাতে যত ক্ষতি বা ধ্বংসই হোক না কেন। কিন্তু তিনি তো ছিলেন খলিফা রাশেদ। নিজের জীবন দেওয়াকে তুচ্ছ মনে করেছেন। তবুও যেন এমন সম্মান বিনষ্ট হতে পারে যা একজন মুসলিমের সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া উচিত।

জীবনের শেষ দিনগুলো -

উসমানের [রদিয়াল্লাহু আনহু] খিলাফতের যখন দ্বিতীয় স্তরে উপনিত হয় তখন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কয়েকজন আত্মীয় স্বজনের সহযোগিতা নেন এবং উমার [রদিয়াল্লাহু আনহু] কর্তৃক নিয়োজিত কয়েকজন কর্মকর্তা বরখাস্ত করেন এবং তাদের স্থলে কয়েকজনকে নতুন নিযুক্ত করেন কিন্তু তারা জনগণের উপর নির্যাতন চালায়। পরবর্তী সময়ে নব-নিযুক্ত কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জনগণ নানা কারণে ক্ষেপে যায়। শেষ পর্যায়ে মিশর কুফা এবং বসরার একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী একাট্টা হয়ে মদীনায় এসে খলিফার পদত্যাগ দাবী করে। ওসমান বিন আফফান তাদের সম্পর্কে জানতে তাদের কাছে দূত পাঠান। পরে জানতে পারেন তারা উসমানকে [রদিয়াল্লাহু আনহু] হয় পদত্যাগ অথবা হত্যা করতে মদিনায় আসে। তখন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ পরামর্শ করে এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার ফায়সালা দেন। কিন্তু উসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু] তা চাননি বরং বলেন, “আমরা এসব বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে ক্ষমা করে দেব।”

পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহীরা নিজেরাই মদিনায় আগমনের কারণ প্রকাশ করেন।
উসমান [রুইয়াল্লহু আনহু] সাধ্যমত তাদের থেকে সরে থাকেন এবং নির্দিষ্ট কিছু
চাহিদা পূরণ করে দেন। ফলে তারা যেভাবে এসেছিল সেভাবে ফিরেও যায়। কিন্তু
পশ্চিমধ্যে শয়তানের প্ররোচনায় তারা আবার মদিনায় ফেরত আসে।

দ্বিতীয়বার তারা মদিনায় এসে উসমানকে [রুইয়াল্লহু আনহু] ৪০ দিন যাবত অবরোধ
করে রাখে। তারা তাকে পানি পেতেও বাধা প্রদান করে। অথচ তখন তার বয়স
ছিল আশির কোঠায়। এক পর্যায়ে তারা ঘর বেয়ে উপরে উঠে ওসমানকে কোরআন
পড়া অবস্থায় দেখতে পায় এবং এ অবস্থায়ই তারা তাকে হত্যা করে।¹⁴

¹⁴ [ইসলামের ইতিহাস পৃষ্ঠা ১১১]

অধ্যায় -৫ আলী হায়দার [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] সংকট ও নেতৃত্ব

নাম ও বংশ - তার নাম আলী। আবুল হাসান ও আবু তুরাব ছিলো তার কুনিয়াত। উপাধি ছিল আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুরতাজা পিতা মাতা উভয়েই কুরাইশ বংশের হাশিমি শাখার সন্তান। তাছাড়া সবচেয়ে বড় পরিচয় আলী [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] ছিলেন স্বয়ং নবীজির [সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] চাচাতো ভাই।

জন্ম - নবীজির [সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নবুয়ত প্রাপ্তির ১০ বছর পূর্বে তার জন্ম হয়। পিতা আবু তালেব ছিলেন অতি দরিদ্র। তাই শিশু আলীর দায়িত্ব নিয়ে নেন নবীজি [সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]। এভাবে আলী নবীজির [সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠেন।

আলীর ইসলাম গ্রহণ - কোন একদিন কিশোর আলী [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] নবীজির [সল্লল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ঘরের ভেতর দেখলেন তিনি খাদিজার [রদ্বিয়াল্লহু আনহা] সাথে সেজদাবনত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ কি?’ উত্তর পেলেন, “এক আল্লাহই ইবাদত করছি তোমাকেও দাওয়াত দিচ্ছি।” আলী [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] তার মুরব্বির দাওয়াত বিনা দ্বিধায় কবুল করেন এবং মুসলিম হয়ে যান।

ফিতনার যুগ আলী- আলী [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] খেলাফত গ্রহণ করেই উসমানের [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] যুগের সব দায়িত্বশীলকে তাদের পথ থেকে অব্যাহতি দেন। কেননা তারাই ছিল ওই ফিতার মূল কারণ। এ ফিতনার কারণেই হযরত উসমানকে [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] হত্যা করা হয়েছিল। তৎকালীন সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] আলীর [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] কথা মানতে অস্বীকার জানান ওসমানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হন।

জঙ্গে জামাল- আলী [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] ইরাকের কুফাকে রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি যখন সেখানে শামের বিদ্রোহ দমন ও মুয়াবিয়া [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] কে অনুগত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন মক্কায় জুবায়ের বিন আউয়াম ও তালহা ওবায়দুল্লাহ [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] এর নেতৃত্বে এক নতুন আন্দোলনের উত্থান ঘটে। উম্মুল মুমিনীন আয়েশাকে [রদ্বিয়াল্লহু আনহা] সাথে নিয়ে বিদ্রোহীরা যখন ইরাকে আগমন করে, তখন আলী তাদের প্রতিহত করতে তার সেনাবাহিনীকে সাথে

নিয়ে নিজ নেতৃত্বে বসরায় গমন করেন।

আলী [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] আলোচনার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সমস্যার সমাধান করেই ফেলেছিলেন প্রায়। ঠিক সেই সময় ফিতনাবাজ ইহুদি আব্দুল্লাহ বিন সাবা উসমানের [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] হত্যাকারীকে সঙ্গে নিয়ে লিগু হয় গোপন চক্রান্তে। প্রথমে তারা আলীকে হত্যার পরিকল্পনা করে; তো তা অসম্ভব দেখে অন্য ষড়যন্ত্র করে। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন তারা তালহা ও জুবায়েরের [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] বাহিনীর উপর হামলা করে এবং ফজরের পূর্বেই পালিয়ে যায় এবং তারা মনে করেন যে একটি আলীর বাহিনী ঘটিয়েছে। উভয় দলের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ বেধে যায় আলী [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] বিজয় লাভ করেন তালহা এবং জুবায়ের [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] নিহত হন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৩৬ হিজরি তথা ৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধে আলীর বিপক্ষে আয়েশা উটের উপর আরোহন করে বলে এই যুদ্ধকে উটের যুদ্ধ তথা জঙ্গে জামাল বলা হয়।

সিফফিনের যুদ্ধ -

আলি [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] মুয়াবিয়ার [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] সাথে বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] সম্মত হলেন না। ফলে তারা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মোকাবেলা করতে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন এবং ৩৭ হিজরি মোতাবেক ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে ফোৱাত নদীর নিকটবর্তী সিফফিন নামক স্থানে দুই দলের মাঝে যুদ্ধ হয়।

খারিজিদের উদ্ভব -

সিফফিনের যুদ্ধে যখন আলী [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] এবং মুয়াবিয়ার [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] মধ্যে মতানৈক্য চরম আকারে পৌঁছে যায় তখন আবু মূসা আসারি বলেন, “অনেক চিন্তা ভাবনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আমরা আলী এবং মুয়াবিয়া উভয়কে তাদের পথ থেকে অপসারিত করব এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্তে নতুন এক খলিফা নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হবে”

এরপর আমর ইবনুল আস বললেন, “তার কথা আমি পূর্ণ সমর্থন করেছি এবং মুয়াবিয়া [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] তার পদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি তাই তাকে খলিফা

ঘোষণা করছি।”

ফলে নতুনভাবে ফিতনাত সৃষ্টি হয় এবং আলীর [রদিয়াল্লাহু আনহু] দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একদল আলীর পক্ষে এবং অন্য দল বিদ্রোহী হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী খাওয়ারিজ বা খারিজি নামে পরিচিতি লাভ করে।

আলীর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য

জ্ঞান -

প্রায় সাহাবী বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য এবং দ্বীনি সমাধান পেতে তার শরণাপন্ন হতেন। আল্লাহর রাসূল [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন আলী [রদিয়াল্লাহু আনহু] তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কাজী।¹⁵

ইব্রাহিম আত তাইমী [রদিয়াল্লাহু আনহু] তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু একবার কুতবাই বলেন, “যে ব্যক্তি বলবে যে আমরা আল্লাহর কিতাব এই সহীফাগুলো (উটের দাঁত এবং কিছু আঘাত বিষয়ক বিধান লেখা ছিল) ছাড়া অন্য কিছু আছে যা শুধু আমরা পড়ি তাহলে সে মিথ্যা বলল।

ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন, উমার বলেন, “আমি এমন কঠিন সমস্যা বা মাসআলা আমার কাছে আশা থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই যা সমাধানের জন্য আবুল হাসান তথা আলী থাকবেন না।¹⁶

বিচার -

আলী [রদিয়াল্লাহু আনহু] অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। জনগণের বিচার ফয়সালা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতেন। ইবনে আব্বাস বলেন, উমার [রদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, আলী [রদিয়াল্লাহু আনহু] আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায় বিচারক। একবার জা'দাহ ইবনে হুযায়রা [রদিয়াল্লাহু আনহু] আলীর [রদিয়াল্লাহু আনহু] নিকট এসে বললেন আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম। আপনার কাছে বিচার প্রার্থী হয়ে এমন

¹⁵ [ইসলামের ইতিহাস পৃষ্ঠা. ১১৫]

¹⁶ [মহৎ প্রানের সান্নিধ্যে, খন্ড ১, পৃষ্ঠায় ১১০- ১১১]

দুজন ব্যক্তি আসে এর মধ্যে আপনি দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষেই রায় দিয়ে দিলেন। অথচ তিনি ছিলেন আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট। অপরদিকে অন্যজন আপনাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। এ কথা শুনে আলী বললেন, “আরে এখানে আমার যদি এখতিয়ার থাকতো তাও আমি এমনই করতাম। কিন্তু এটি তো আল্লাহর বিধান।”¹⁷

সাহসিকতা -

আলী বিন আবি তালেব [রদিয়াল্লাহু আনহু] কখনো মূর্তিকে সেজদা করেননি এবং আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করেননি। যার ফলে তার নামের সাথে ‘কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু’ দেওয়া হয়। হিজরতের সময় রাসূলের বিছানায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে ছদ্মবেশে শুয়ে ছিলেন।

জীবদ্দশায় তিনি কখনো কোন যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেননি। যার সাথেই যুদ্ধে লড়েছেন বিজয়ী হয়েছেন। বদর যুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম লড়াই শুরু করেন। উহুদ ও হুনাইন যুদ্ধে নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সাথে যারা রণাঙ্গনে অটল ছিলেন তিনি তাদেরই একদিন।¹⁸

ইসলামের জন্য আলীর [রদিয়াল্লাহু আনহু] অবদান অবিস্মরণীয়। নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] যুগের সকল যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি এ কারণে নবীজি ‘হায়দার’ উপাধিসহ ‘যুলফিকার’ নামক তরবারি উপহার করেন।¹⁹

¹⁷ [আল কাওসার সংখ্যা মার্চ-২৬, আদর্শ শাসক খুলাফায়ে রাশেদার জীবন থেকে কিছু নমুনা পৃষ্ঠা ৪৭]

¹⁸ [ইসলামের ইতিহাস পৃষ্ঠা ১১৫]

¹⁹ [আসহাবে রাসূলের জীবন কথা খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৬১]

তুলনামূলক বিশ্লেষণ -

চার খলিফার নেতৃত্বের পার্থক্য -

খুলাফায়ে রাশেদার চার খলিফা ইসলামের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসে চারটি ভিন্ন নেতৃত্বধারার প্রতিনিধিত্ব করেন। তাদের প্রত্যেকের শাসনকাল ভিন্ন পরিস্থিতি, চ্যালেঞ্জ এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের মুখোমুখি হয়েছিল। ফলে তাদের নেতৃত্বের ধরনেও স্বাভাবিকভাবেই কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যদিও তাদের মৌলিক লক্ষ্য ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ নিশ্চিত করা, তবুও পরিস্থিতিভেদে তাদের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য পৃথক রূপ ধারণ করে।

আবু বকরের [রদিয়াল্লাহু আনহু] নেতৃত্ব মূলত সংকট ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংরক্ষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ইন্তেকালের পর নবগঠিত মুসলিম সমাজ এক গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হয়। বিভিন্ন গোত্রের বিদ্রোহ, যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার প্রবণতা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে আবু বকর [রদিয়াল্লাহু আনহু] দৃঢ়তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহস এবং নীতিগত অবস্থানের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর নেতৃত্বকে তাই সংকটকালীন ও সংহতিমূলক নেতৃত্বের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উমার বিন খাত্তাবের [রদিয়াল্লাহু আনহু] শাসনামল ছিল প্রশাসনিক উন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের যুগ। তাঁর সময় ইসলামী সাম্রাজ্য দ্রুত সম্প্রসারিত হয় এবং নতুন অঞ্চলসমূহ মুসলিম শাসনের অধীনে আসে। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিচালনার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন করেন, যেমন প্রাদেশিক প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা এবং সরকারি কোষাগার পরিচালনা। ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা এবং জনকল্যাণ ছিল তাঁর শাসননীতির মূল ভিত্তি। ফলে তাঁকে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশাসক ও রাষ্ট্রনির্মাতা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়।

উসমান বিন আফফান [রদিয়াল্লাহু আনহু] নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং রাষ্ট্রের অব্যাহত সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা। তাঁর শাসনামলে

সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তার আরও বৃদ্ধি পায় এবং সামুদ্রিক শক্তির বিকাশ ঘটে। তিনি শান্ত স্বভাব, উদারতা এবং সহনশীলতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তবে তাঁর প্রশাসনিক নিয়োগ নীতি, বিশেষত আত্মীয়স্বজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ, কিছু রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তবুও কুরআনের পাঠ সংরক্ষণ ও একীভূতকরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

আলী বিন আবি ত্বলিব [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] নেতৃত্ব মূলত ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং আদর্শিক দৃঢ়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি এমন এক সময়ে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যখন মুসলিম সমাজ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভাজন ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। তাঁর শাসনামলে বিভিন্ন গৃহযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক বিরোধ দেখা দেয়, যা রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। তবুও তিনি ন্যায়ের প্রশ্নে আপস না করে নীতিগত অবস্থান বজায় রাখার চেষ্টা করেন। তাঁর নেতৃত্বে নৈতিক মূল্যবোধ এবং আদর্শিক সততার প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

চার খলিফার নেতৃত্বকে এক বাক্যে বললে-

আবু বকর [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] — ঐক্য রক্ষাকারী নেতা।

উমর [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু] — রাষ্ট্র ও প্রশাসন নির্মাতা।

উসমান [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু]— সম্প্রসারণ ও সংহতির নেতা।

আলী [রদ্বিয়াল্লাহু আনহু]— ন্যায় ও নীতির নেতা।

শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের ধারা -

খুলাফায়ে রাশেদার শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, চার খলিফার আমলে ইসলামী রাষ্ট্র ধীরে ধীরে একটি ছোট ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক রাষ্ট্র থেকে সুসংগঠিত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এই উন্নয়ন ছিল ধারাবাহিক, যেখানে প্রত্যেক খলিফা পূর্ববর্তী খলিফার অর্জনের ওপর ভিত্তি করে নতুন মাত্রা যোগ করেন।

প্রথমত, আবু বকরের [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] আমলে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও ঐক্য রক্ষা। নবীজির [সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ইন্তেকালের পর আরবের বিভিন্ন গোত্র বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করলে তিনি দৃঢ় হাতে বিদ্রোহ দমন করেন এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শাসনামলে প্রশাসনিক কাঠামো তুলনামূলকভাবে সরল ছিল, তবে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তিকে সুসংহত করেন। ফলে পরবর্তী সম্প্রসারণের জন্য একটি স্থিতিশীল ভিত্তি তৈরি হয়।

দ্বিতীয়ত, উমার ইবনুল খাতাবের [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক উন্নয়ন সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্য ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হওয়ায় তিনি একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসন গড়ে তোলেন। প্রদেশভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, রাজস্ব সংগ্রহ, বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার), পুলিশি কার্যক্রম এবং সরকারি কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা চালু করেন। অনেক গবেষক তাঁর আমলকে ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার "প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের যুগ" বলে অভিহিত করেন।

তৃতীয়ত, উসমান বিন আফফানের [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] আমলে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়। সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তার উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ও সমুদ্রপথ পর্যন্ত পৌঁছায়। এই সময়ে নৌবাহিনীর বিকাশ ঘটে, যা ইসলামী রাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে কুরআনের মানক সংকলন সম্পন্ন হওয়ায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্যও শক্তিশালী হয়। তবে প্রশাসনের কেন্দ্রীয়করণ এবং গভর্নর নিয়োগ নিয়ে কিছু রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দেয়, যা পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় সংকটের কারণ হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, আলি বীন আবি তালিবের [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] আমলে প্রশাসনিক উন্নয়নের চেয়ে রাষ্ট্রীয় সংকট মোকাবিলা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি প্রশাসনে ন্যায় ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং পূর্ববর্তী কিছু গভর্নরকে পরিবর্তন করে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধ ও গৃহযুদ্ধের কারণে তাঁর অনেক সংস্কার পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হতে

পারেনি। তবুও তাঁর শাসনামল ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তায় ন্যায়ভিত্তিক ও নৈতিক নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়।

সামগ্রিকভাবে খুলাফায়ে রাশেদার শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের ধারাকে চারটি ধাপে ভাগ করা যায়:

রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা (আবু বকর [রদিয়াল্লাহু আনহু]),

প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান গঠন (উমর [রদিয়াল্লাহু আনহু]),

সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও প্রশাসনিক বিস্তার (উসমান [রদিয়াল্লাহু আনহু]), এবং

ন্যায়ভিত্তিক সংস্কার ও সংকট মোকাবিলা (আলী [রদিয়াল্লাহু আনহু])।

এই ধারাবাহিক উন্নয়নের ফলে ইসলামী রাষ্ট্র একটি সীমিত আরবভিত্তিক রাজনৈতিক কাঠামো থেকে একটি সুসংগঠিত ও বহুজাতিক সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়, যা পরবর্তী ইসলামি শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

চ্যালেঞ্জ ও সমাধান-

খুলাফায়ে রাশেদার যুগ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের যুগ। এই সময়ে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিটি খলিফা তাঁদের সময়ের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেন, যা ইসলামী শাসনব্যবস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আবু বকরের [রদিয়াল্লাহু আনহু] শাসনামলের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নবীজির [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ইন্তেকালের পর মুসলিম সমাজে সৃষ্ট অস্থিরতা। আরবের অনেক গোত্র ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করে এবং কিছু ব্যক্তি নবুয়তের দাবিও করে। এছাড়া অনেক গোত্র যাকাত প্রদান বন্ধ করে দেয়। আবু বকর [রদিয়াল্লাহু আনহু] এই সংকটকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং দৃঢ় সামরিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রিদ্দাহ যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি বিদ্রোহ দমন করেন এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

উমার ইবনুল খাত্তাবের [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] সময় প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল দ্রুত সম্প্রসারিত সাম্রাজ্যকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা। অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল অঞ্চল ইসলামী শাসনের অধীনে চলে আসে, যার ফলে প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এই সমস্যা সমাধানে তিনি প্রাদেশিক প্রশাসন গঠন, বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা, বায়তুল মাল পরিচালনা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা চালু করেন। এছাড়া তিনি নিয়মিতভাবে গভর্নরদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর এসব পদক্ষেপ প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

উসমান বিন আফফানের [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] আমলে রাষ্ট্রীয় সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকলেও রাজনৈতিক অসন্তোষ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। কিছু অঞ্চলে গভর্নর নিয়োগ এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা সৃষ্টি হয়। একই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের পাঠভেদ নিয়ে বিভ্রান্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। উসমান [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] কুরআনের একটি মানক পাঠ সংকলন ও প্রচারের মাধ্যমে ধর্মীয় ঐক্য রক্ষার চেষ্টা করেন। তবে রাজনৈতিক অসন্তোষ ক্রমে তীব্র হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে প্রথম বড় রাজনৈতিক সংকটের সূচনা ঘটে।

আলী বিন আবী তালিবের [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] শাসনামলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল অভ্যন্তরীণ বিভাজন ও গৃহযুদ্ধ। উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মুসলিম সমাজ বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জামাল ও সিফফিনের মতো সংঘাত রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে দেয়। আলী (রা.) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে সংকট মোকাবিলার চেষ্টা করেন। যদিও তিনি দীর্ঘমেয়াদে সম্পূর্ণ স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হননি, তবুও ন্যায়ভিত্তিক নেতৃত্ব ও নৈতিক অবস্থানের মাধ্যমে ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, খুলাফায়ে রাশেদার যুগের চ্যালেঞ্জগুলো চারটি প্রধান ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত ছিল—রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাত মোকাবিলা।

আবু বকর [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] সামরিক ও রাজনৈতিক দৃঢ়তার মাধ্যমে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন,

উমর [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেন,

উসমান [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] ধর্মীয় ও সাংগঠনিক ঐক্য রক্ষার চেষ্টা করেন এবং আলী [রদ্বিয়াল্লহু আনহু] ন্যায়ভিত্তিক নেতৃত্বের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের প্রচেষ্টা চালান। এই ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পরবর্তী বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলে এবং মুসলিম শাসনচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি গড়ে তোলে।